মীর মশাররফ হোসেনের একটি গ ান

সুপ্রতীপ দেব দাস

এবং ঊনিশ শতকের হিন্দু জাতীয়তাবাদের স্বরূপ

বাঙালী সাহিত্য-পাঠকের কাছে মীর মশাররফ হোসেনের (১৩.১১.১৮৪৭ - ১৯.১২.১৯১১) পরিচয় মূলত ঃ ‘ বিষাদ-সিন্ধু’ (১৮৮৫-১৮৯১) গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবেই। এই একদেশদর্শী ‘পরিচয়ের’ আড়ালে মীর মশাররফের বহুমুখী প্রতিভ ার সম্যক পরিচয় গড়পড়তা বাঙালীর কাছে প্রায় অজ্ঞাতই থেকে গেছে। এই কারণে অনেকেই আমরা কোনোদিন জ ানতে পারিনি অথবা কখনও জানলেও ভুলে গিয়েছি যে ‘বিষাদ- সিন্ধু’র স্রষ্টা এই মশাররফ হোসেন একদা বেশ কিছু সুন্দর বাংলা গানও রচনা করেছিলেন। এই গানগুলির কয়েকটি সেকালে সাধারণ্যে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তঁ ার রচিত বাউলাঙ্গের গানগুলি সময়কালের বিশেষ কারণেই সঙ্গীতপ্রেমী বাঙ্গালী শ্রোতাদের জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। তাছাড়া তাঁর গানের মধ্যে সেকালের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের নানা গুত্বপূর্ণ বিষয় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে সন্নিবিষ্ট হয়ে সমাজমানসকেও অল্পবিস্তর আলোড়িত করেছিল। প্রবাদপ্রতিম বাউলসাধক ল ালন ফকিরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁর সমকালে নদীয়া - বিশেষত ঃ কুষ্টিয়া - কুমারখালি অঞ্চলে বাউল এবং লে াকজ ভাবসঙ্গীতের যে ব্যাপক অনুশীলনের মরমীয়া পরিবেশ রচিত হয়েছিল তাই তাঁকেসঙ্গীত রচনায় প্রাণিত এবং উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। অবশ্য সাহিত্য-গু কাঙাল হরিনাথও এক্ষেত্রে তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। গানের শেষে তিনি স্বন ামের সংক্ষিপ্ত রূপ হিসাবে ‘মশা’ ভণিতা ব্যবহার করতেন। যেহেতু তিনি বাউল ঐতিহ্যে লালিতপালিত হননি ফলে তাঁকে কাঙ্গাল হরিনাথের মতই ‘সখের বাউল’ বলা চলে।

মীর মশাররফ হোসেনের সঙ্গীত প্রতিভার সামগ্রিক পর্যালোচনা বর্তমান রচনার উদ্দেশ্য না হলেও সূচনায় আমরা তাঁর সঙ্গীস মনস্কতা এবং সাংগীতিক সৃজনকর্মের যৎসামান্য পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। তাঁর স্বলিখিত জীবনপাঠে জানা যায় ‘তিনি ছেলেবেলায় খুব দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন। তাঁকে শান্ত করবার একমাত্র উপায় ছিল গান বাজনা আর নাচ।’ জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন জমিদার বংশের সন্তান। তাঁর আত্মীয়স্বজনরাও অধিকাংশই ছিলেন সংগতিসম্পন্ন ভূস্বামী। বিল াস- বৈভব বহুল এই পারিবারিক পরিমণ্ডলে কৈশোরেই তিনি “ইংরেজী বাজনা, খেমটা ওয়ালিদের নাচ, অন্যান্য নাচগ ান,‘বাইজীদের মজুর’ প্রভৃতি দেখা ও শোনার সুযোগ পান।” (দ্রষ্টব্য ঃ মীর মশাররফ হোসেন। সিরাজুদ্দীন আমেদ। সা হিত্য একাডেমী। পৃ ঃ ৯) আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, “গানবাজনা শুনিতে আমার স্বভাবজাত বাসনা। গান বাজনার অ াওয়াজ শুনিলে মন নাচিয়ে ওঠে। সে স্থানে উড়িয়া যাইতে ইচছা হয়।” (উৎস প্রাগুক্ত গ্রন্থ। পৃ ঃ ১১)

১৮৮৭ সালে মীর মশাররফ হোসেনের সঙ্গীতের সংকলন গ্রন্থ ‘সঙ্গীত লহরী’ প্রকাশিত হয়। সুর ও তালের সুনির্দিষ্ট উল্লেখসহ এখানে মোট ৯১টি গান গ্রন্থিত হয়েছে। অবশ্য কিছু কিছু গানে সুর ও তালের কোন নির্দিষ্ট নির্দেশিকা নেই। মূলত ঃ গেয় হলেও এই সঙ্গীত পদগুলি আসলে গীতিকবিতার সমষ্টি। ফলতঃ এই পদগুলিতে কিছু কিছু সাহিত্য গুণেরও স্বাভাবিক এবং সাবলীল প্রকাশ ঘটেছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তঁ ার ‘সাহিত্য-সাধক চরিতমালা’ গ্রন্থে‘সঙ্গীত লহরী’

নামে চারটি গান উদ্ধৃত করেছেন। মশার্‌রফ-রচিত গানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাউল সঙ্গীতের শিল্প শৈলী, ভাষা এবং ভাব াদর্শ অনুসৃত হয়েছে। মশার্‌রফ হোসেন প্রথম যৌবনে কাঙাল হরিনাথ বা কাঙাল ফিকিরচাঁদ ফকিরের সাথে পরিচিত হন। ফিকিরচাঁদ ছিলেন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ বাউল সাধক ফকির লালন শাহের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর সূত্রেই মশার্‌রফ লালন ফকির এবং তাঁর রচিত সঙ্গীতের পরিচয় লাভ করেন। হরিনাথ তাঁর 'সখের বাউল' দল নিয়ে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে স্ব রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। বলা বাহুল্য তিনি ও তাঁর সম্প্রদায় লালন ফকিরের গানও গাইতেন। হরিনাথ এবং ল ালনের প্রভাবে মীর মশার্‌রফ বেশ কিছু বাউলগানরচনা করেন। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন লিখেছেন, ''ছেঁড়িয়ার অনতিদূরে লাহিনীপাড়া অবস্থিত। মীর মশার্‌রফ হোসেন তথায় বাস করিতেন ও 'হিতকারী'তে লিখিতেন।''(দ্রষ্টব্য ঃ লালন গীতিক া১ম খণ্ড। সম্পাদনা মুহম্মদ কামাল উদ্দীন। তৃতীয় সংস্করণ। ফেব্রুয়ারী১৯৭৭

মশার্‌রফ-জীবনী প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বাল্যকাল থেকেই তিনি নাচগান এবং বাদ্যযন্ত্রের শব্দধবনির বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তাছাড়া অভিজাত মীর পরিবারে সঙ্গীতের নিয়মিত চর্চাও ছিল। মশার্‌রফের পিতা মোয়াজ্জম হে াসেন নিজেও বাদ্যসঙ্গীত চর্চা করতেন। সেকালের অন্যান্য জমিদার পরিবারের মত মীর পরিবারেও নর্তকী এবং ব াঈজীদের নাচ-গান যথেষ্ট সমারোহ সহকারে অনুষ্ঠিত হত। মশার্‌রফ স্বভাবতই পারিবারিক সাংগীতিক সূত্রেই সংগীত চর্চ া এবং তার রস সম্ভোগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অর্জন করে ছিলেন। তাঁর 'সঙ্গীত লহরী''গ্রন্থে সংকলিত সঙ্গীতগুলির প্রধান উপজীব্য নরনারীর প্রেম। আধুনিক রীতিতে রচিত গজলের অনুসরণেও তিনি কিছু কিছু গান রচনা করেছেন। তাঁর গানে সমকালীন সমাজের বাস্তব চিত্রও সজীব সুষমায় ফুটে উঠেছে। অবশ্য কাব্য সমালোচকেরা অনেকেই মনে করেন'সঙ্গীত লহরী'র গীতি কবিতাগুলি মোটামুটি সুখপাঠ্য হলেও এগুলিতে কবি হিসাবে মশার্‌রফের বিশেষ কোনো কৃতিত্ব বা স ার্থকতা লক্ষ্য করা যায় না। তবে তাঁর রচিত সঙ্গীতের বেশিরভাগেই-বিশেষত ঃ পূর্ববাংলার লোকসঙ্গীতের যে সহজ সরল কথা এবং জারিসারি গানের মরমীয়া সুরের সংযোগ ঘটেছে তা সেকালের রসজ্ঞ সঙ্গীত প্রেমীর অল্পবিস্তর সমাদর লাভ করেছে।

স্বদেশপ্রেমের'ঋষি' বঙ্কিমচন্দ্র এদেশে যে জাতীয়তাবাদের প্রচার করেন তাও ছিল সম্পূর্ণভাবে ধর্মভিত্তিক এবং বলাবাহুল্য সে ধর্ম হিন্দু ধর্ম। অন্য ধর্ম এবং ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষ এবং বিরূপতাই এই 'মহান' জাতীয়তার প্রাণশক্তির উৎস। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন,'আমি হিন্দু, তুমি হিন্দু, রাম হিন্দু, যদু হিন্দু,আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে। এই লক্ষ লক্ষ হিন্দুমাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে তাহাদের মঙ্গল নাই, আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকল হিন্দুর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই আমার কর্তব্য। যাহাতে কোন হিন্দুর অমঙ্গল হয়, তাহা আমার অকর্তব্য। যেমন আমার এইরূপ কর্তব্য আর এইরূপ অকর্তব্য , তোমারও তদ্রূপ কার্য্য হইল তবে সকল হিন্দুর কর্তব্য যে একপরামর্শী, একমতাবল ম্বী, একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করা, এই জ্ঞান জাতি প্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ, অর্দ্ধাংশ মাত্র। হিন্দু জাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গলমাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, আমরা তাহাই করিব। ইহ াতে পরজাতি পীড়ন করিতে হয়, করিব। অপিচ যেমন তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল হইতে পারে। হয় হউক, আমরা সে জন্য আত্মজাতির মঙ্গল সাধনে বিরত হইব না। পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিতে হয়, তাহাও করিব। জাতি প্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ। (উৎস বিবিধ প্রবন্ধ -- ভ ারত কলঙ্ক। ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?)

মুসলমান বা যবনবিরোধী এবম্বিধ হিন্দুজাতীয়তার সুসংহত এবং সর্বব্যাপক প্রকাশ ঘটে সিপাহী বিদ্রোহের দশ বছর পরে (১৮৬৭) পরিষ্ঠিত হিন্দুমেলার মধ্য দিয়ে। এই মেলাকে নামান্তরে জাতীয় মেলা (তাৎপর্য হিন্দুর জাতীয়মেলা বা হিন্দুজা তির মেলা।) বলে উল্লেখ করা হলেও এই মেলায় মুসলমানের কোন স্থান ছিল না। ১৮৬৭ থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত এই মেলার চৌদ্দটি বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলেও একমাত্র ব্যতিত্রম মেলার নবম অধিবেশনে (১৮৭৫) হিন্দুস্থানী

সংগীতের অনুরাগী শিল্পী বরোদার অধিবাসী ওস্তাদ মৌলাবের সংগীত পরিবেশন ছাড়া এই মেলায় মুসলমান বা (হিন্দু ব্যতীত) অন্য সম্প্রদায়ের কোন মানুষের কোন স্থান ছিল না। বার্ষিক এই হিন্দু মেলার সম্বৎসরের কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা এবং রূপায়ণের জন্য এই মেলার অবিচ্ছেদ্য অহঘ হিসাবে জাতীয় সভা' বা National Society নামে একটি মাসিক কর্ম সমিতি গঠন করা হয়। ''হিন্দু জাতির সর্বশ্রেণীর মধ্যে জাতীয়ভাবের বর্ধন এবং উন্নতি সাধন করাই এই সভার মূল উদ্দেশ্য। অনূন্য একমুদ্রা বার্ষিক দান করিলে হিন্দু নাম্যধারী মাত্রেই এই সভার সভ্যতা পদের অধিকারী হইবেন।'' সর্ব-সাম্প্ররদায়িক হিন্দু স্বজাতীয় সর্বপ্রকার উন্নতি পক্ষে উৎসাহ দান ও উপায় অবলম্বন' যে হিন্দু মেলার উদ্দেশ্য তার নিগূঢ় তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে হিন্দুমেলা ও জাতীয়সভার বরিষ্ঠ উদ্যোক্তা কবি ওনাট্যকার মনোমোহন বসু বলেন, হিন্দুমেলা হবে এমন একটি মিলনস্থল যেখানে বৈষ্ণব শাক্ত, শৈব গাণপত্য, বৌদ্ধ, জৈন, নাস্তিক, আস্তিক-নির্বিশেষে ভারতবর্ষস্থ সর্বশ্রেণীর হিন্দু ধর্ম সংক্রান্ত সমস্ত মতভেদ ভুলে সকলেই সৌভ্রাতৃত্ব ও সৌহৃদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। তাছাড়া নেপালী, পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্রী, প্রভৃতি সর্বভারতের হিন্দুরাই এখানে মিলিত হবেন। অর্থাৎ হিন্দুমেলা ও তার অনুষঙ্গজাতীয় সভায় মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি অহিন্দুর কোনো স্থান ছিল না। (দ্রষ্টব্যঃ হিন্দু-মুসলমান' সমস্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ রবীন্দ্র প্রসঙ্গ। প.ব. সরকার।(১৩৯৫ বঙ্গাব্দ) হিন্দুমেলা এবং তার নীতিনির্ধারক অনুপূরক সংগঠন জাতীয় সভায় যে মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি অহিন্দুর কোন স্থান ছিলনা, মেলার উদ্যোক্তাদের বক্তব্য এবং আচরণে বার বার তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। আচার্য্য প্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছেন, সেকালে ঠাকুর পরিবারেও এই হিন্দু জাতীয়তা প্রবল ছিল। হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভা স্থাপনের মূলে ছিল ঠাকুর পরিবারেরই সহায়তা ও সমর্থন। গণেন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথের বিভিন্ন উক্তিতে বারবারই হিন্দুজাতি কথাটা উচচারিত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের 'মিলে সবে ভারত সন্তান' ইত্যাদি বিখ্যাত জাতীয় সংগীতটি তো আসলে হিন্দু ভারতেরই জয়গান। তাতে ভীষ্ম দ্রোণ থেকে পৃথ্বীরাজ পর্যন্ত বীরদের কীর্তিমহিমা উদগীত হয়েছে। তারপরেই যবনের আবির্ভাবের ফলে অধীনতা আনিল রজনী। অর্থাৎ বৈদেশিক বিজেতা মুসলমানের হাতেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও কীর্তিগৌরব বিনষ্ট হয়। সেই স্বাধীনতা ও গৌরব ফিরিয়ে আনাই যে সব প্রতিষ্ঠানের (হিন্দুমেলা, জাতীয়সভা তথা রাজনারায়ণের সঞ্জীবনী সভা) লক্ষ্য স্বভাবতই বিজেতৃজাতীয় মুসলমানকে সে সব প্রতিষ্ঠানে গ্রহণ করা চলে না (উৎস প্রাগুক্ত গ্রন্থ। পৃষ্ঠা ৭-৮) । হিন্দু স্বাদেশিকতার একদেশদর্শী চরিত্র বর্ণনা করে চরমপন্থী জাতীয় নেতা বিপিনচন্দ্র পাল (৭.১১.১৮৫৮-২০.৫.১৯৩২) লিখেছিলেন, ''সেকালে এই ভারতবর্ষটা কেবল হিন্দুরই দেশ, মুসলমান-খ্রীষ্টান প্রভৃতির এই দেশের উপর দাবী আছে-- ইহা শিক্ষিত সমাজের মনে উদয় হয় নাই। এই সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার প্রেরণায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুত্বের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন... আর সেই স্বাদেশিকতার প্রেরণাতেই নবগোপাল হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা করেন।''

পারস্যের সুফী কবিদের ভক্তপাঠক এবং পার্শীভাষায় সুপণ্ডিত দেবেন্দ্রনাথ যে তাঁর আদি ব্রাহ্মসমাজকে কখনই প্রচলিত হিন্দু সমাজের বাইরে কোন স্বতন্ত্র সত্তা বা কর্মধারায় অভিষিক্ত করতে চাননি, তার বিস্তর প্রমাণ আমাদের জানা আছে। কট্টর হিন্দুবাদী বর্বরতার প্রেরণায় যারা রামমোহনের উদারপন্থী ধর্মসংস্কার আন্দোলনকে কুৎসিৎভাবে আক্রমণ করেছিলেন, হিন্দু সমাজের সেই সমস্ত নেতা এবং পৃষ্ঠপোষকদের সাথেও তিনি সর্বদাই অবলীলায় হাত মিলিয়েছেন এবং বলাবাহুল্য, এ সবই তিনি করেছেন বৃহত্তর হিন্দুসমাজের সম্প্রদায়গত (মূলতঃ খ্রীষ্টান মিশনারী সম্প্রদায়ের প্রতিস্পর্ধী হিসাবে) সংহতি এবং সমৃদ্ধির স্বার্থে। হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত ছেলেদের শিক্ষার প্রয়োজনে সনাতন হিন্দুধর্মের প্রধান নেতা রাজা রাধাকান্তা দেব বাহাদুরের (১০-৩-১৭৮৩--১৯-৪-১৮৬৭) সভাপতিত্বে ১৮৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয়' এর সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন ব্রাহ্মনেতা দেবেন্দ্রনাথ। তাঁর সঙ্গী সম্পাদক হিসাবে ছিলেন হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিওকে বহিষ্কারের অন্যতম প্রধান নায়ক দেওয়ান রামকমল সেনের রক্ষণশীল পুত্র হরিমোহন সেন। এই বিদ্যালয়ের কর্মসমিতিতে অধ্যক্ষ ছিলেন রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর,অপূর্বকৃষ্ণ বাহাদুর, সত্যচরণ বাহাদুর, বাবু আশুতোষ দেব, প্রমথনাথ দেব, ব্রজনাথ ধর, মতিলাল শীল, রমানাথ ঠাকুর, রাজ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নীলরত্নম হালদার, বীর নৃসিংহ মল্লিক, রমাপ্রসাদ রায়, নন্দলাল সিংহ, দুর্গাচরণ দত্ত, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কাশীনাথ বসু, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মিত্র। (দ্রষ্টব্যঃ সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজত্রি ৫মখণ্ড, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ২। স

ম্পাদনা বিনয় ঘোষ) বলাবাহুল্য এই অধ্যক্ষদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সেকালের হিন্দু প্রতিক্রিয়াশীলতার শিরোমণি)।

পৌত্তলিক হিন্দুধর্মের শতধাবিভক্ত অচলায়তনকে চূর্ণ করে এক ঋজনীন মানবসমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্মাদর্শের অসাম্প্রদায়িক রূপরেখাটি রচনা করলেও তাঁর মৃত্যুর কয়েক দশক পরে প্রবীণ এবং নবীন কিছু ব্রাহ্মনেতা সেই প্রত্যাখ্যাত এবং পরিত্যক্ত হিন্দুধর্মকেই আঁকড়ে ধরেন প্রবল উৎসাহ এবং উন্মাদনা সহকারে। রামমোহনের মহান আদর্শ এবং ঐতিহাসিক সংগ্রামকে তাঁরা প্রায় সচেতন ভাবেই পশ্চাৎ থেকে ছুরিবিদ্ধ করেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এবং ক্ষতিকারক ভূমিকা যিনি পালন করেন তিনি অবশ্যই 'ঋষি' রাজনারায়ণ বসু। এই আত্মধ্বংসী সর্বনাশা কর্মকাণ্ডে কেশবচন্দ্র সেন এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কৃতিত্বও অবশ্য কিছু কম নয়। এদেশে হিন্দুধর্মভিত্তিক জাতীয়তা এবং স্বদেশিকতার আদি উদ্‌গতা অবশ্যই রাজনারায়ণ বসু। হিন্দুমেলা এবং জাতীয়সভারও অন্যতম স্থাপয়িতা এবং ত্রাণপুষ তাঁর আত্মচরিত গ্রন্থে রাজনারায়ণ লিখেছেন, হিন্দুধর্মের প্রতি আমার চিরকালই শ্রদ্ধা আছে। আমি আপনাকে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের সমুন্নত আকারমাত্র মনে করি। অথচ বাস্তব ঘটনা এই যে, রামমোহনের উদার- অসাম্প্রদায়িক আদর্শের সর্বাধিক সর্বনাশ সাধন করে এই রাজনারায়ণ বসুই ব্রাহ্ম আন্দোলনের গতিমুখকে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে কার্যত তাকে সনাতন হিন্দুধর্মের অক্ষম তল্পীবাহকে পর্যবসিত করেন। যে তমসাচ্ছন্ন, অন্ধ, যুক্তিহীন, উদ্ধত এবং অহংসর্বস্ব হিন্দুবাদী নেতাদের রামমোহন তীব্র ঘৃণার সাথে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছিলেন, হিন্দুধর্মের চ্যাম্পিয়ন সেজে ঋষি রাজনারায়ণ সেই ঘৃণ্য, সংকীর্ণচেতা এবং সাম্প্রদায়িক নেতাদেরই এবং তাদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের পরম সমাদরে আলিঙ্গন করে এদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনে অপরিমেয় ক্ষতিসাধন করেছিলেন। একজন প্রবীণ ব্রাহ্মনেতার এই হিন্দুবাদী পুনরভ্যুত্থানের ভাবোন্মাদনাময় দৃষ্টান্তে গোঁড়া হিন্দু নেতারা এবং তাঁদের ছোট-বড় মাঝারী অনুগামীরা স্বভাবতই প্রবলভাবে উত্তেজিত এবং উজ্জীবিতবোধ করেন। ভাবাবেগপ্রবণ বন্ধু নবগোপাল মিত্র (১৮৪০-১৮৯৪) তো বটেই এমনকি প্রখর যুক্তিবাদী এবং ইতিহহাস প্রাজ্ঞ বঙ্কিমচন্দ্রও রাজনারায়ণের হিন্দুবাদী ক্রিয়াকর্মে প্রবলভাবে উল্লসিত এবং অনুপ্রাণিত বোধ করেন। বঙ্কিমের সমসাময়িক রচনাবলীতে তার ভূয়সী দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। বঙ্কিম-নবগোপাল ছাড়াও এই হিন্দু বাদী উন্মাদনার কলরবকে যারা উচচকিত কণ্ঠশব্দ এবং কুৎসিত কদর্য বাচনভঙ্গিমা সহকারে দেশের আপামর জনসাধারণের শ্রবণ, মনন এবং দৈনন্দি জীবনচারণে গভীরভাবে প্রোথিত করে দিতে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই মহাত্মাদের মধ্যে শশধর তর্কচূড়ামণি(১৮৫১-১৯২৮) কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বা কৃষ্ণনন্দ স্বামী (১২৫৮-১৩০৯বঙ্গাব্দ) এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১১.১২.১৮৪৬-২.১০.১৯১৭) প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শশধর তর্কচূড়ামণি সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছিলেন, হিন্দুদের প্রাচীন শাস্ত্র এবং মধ্যযুগীয় ধর্মবিশ্বাসকে আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যার একটি নতুন পদ্ধতি তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন। হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস এবং শাস্ত্রাচার যে সম্পুর্ণ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সেটা পতিপন্ন করাই ছিল তাঁর এই নতুন ব্যাখ্যারীতির আসল উদ্দেশ্য। যে কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের দেশজ কৃষ্টি ঋদ্ধ সঙ্গীত একদা যুবক রবীন্দ্রনাথ সহ অগণিত সঙ্গীতপ্রেমী বাঙালীকে মুগ্ধ করেছিল, দুঃখের বিষয়, তিনিও ছিলেন সেকালের যুক্তিবিচাররহিত হিন্দুধর্মীয় উন্মাদনারই একজন নেতৃস্থানীয় প্রবক্তা। বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছিলেন, কদর্য রসিকতা এবং শব্দের কূট-কাচালীর মাধ্যমে ধর্মবিশ্বাসী সরল সাধারণ মানুষের সংবেদনশীল ভাবানুভূতিকে প্ররোচিত এবং উত্তেজিত করবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল কৃষ্ণপ্রসন্নের। নবজীবন পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র লিখেছিলেন , যাবতীয় প্রগতিশীল সামাজিক ধারণার কঠোরতম প্রতিপক্ষ ছিলেন তিনি। সমসাময়িক কালে সংবাদপত্র এবং সাহিত্য সংস্কৃতি ধর্মনিরপেক্ষ এবং সর্বমানবিক ঋজনীন ভাবনা ধারণার বিদ্ধে নিরন্তর উগ্র আত্রমণাত্মক এবং উন্মাদনাময় রচনা প্রকাশিত হতে শু করে। সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের উপর একান্তভাবে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রাধান্যের কথা ঘোষণা করে এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয় সরকার, শশধর, তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ নেতৃত্বে বঙ্গদর্শন, সাধারণী প্রচার নবজীবন সোমপ্রকাশ ইত্যাদি পত্রিকায় হিন্দুবাদী প্রতিক্রিয়াশীলতার যে গগনভেদী, কোরাস সঙ্গীত শোনা যায় তা ছিল প্রকারান্তরে বাঙালীর ভবিষ্যৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের শেষযাত্রার গান । শ্রী বিনয় ঘোষ লিখেছেন, উনিশ শতকের প্রগতিশীল আন্দেলনের ধারা এই সময় বিপরীত দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ, স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পূর্বের জোয়ারের টানে তা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার উপত্রম হয় (দ্রষ্টব্যঃ বিদ্যাস

াগর ও বাঙালী সমাজ। (পৃষ্টা ৩১৭) এই সময় বাংলা নাটক এবং বঙ্গরঙ্গমঞ্চও হিন্দু পুনত্থানবাদের পীঠস্থানে পরিণত হয়। যাবতীয় রকমের প্রগতিশীল ভাবাদর্শ এবং সংশ্লিষ্টি আন্দোলন গুলিকে যথেচ্ছ ব্যঙ্গ এবং বিদ্রূপাত্মক আত্রমণ রচনা কর াই এযুগের অধিকাংশ বাংলা নাটক, নাট্যমঞ্চ এবং নাট্যকারদের মুখ্য কাজে পরিণত হয়। রঙ্গমঞ্চে সমাজপ্রগতির ভাবন াকে হননের এই কর্মকাণ্ডে নির্ণায়ক ভূমিকায় অবতীর্ণ হন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উৎসাহী ভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ। পৌরা ণিক হিন্দু ধর্মকে ভারতীয় নাট্যচর্চার মূল উপজীব্য হিসাবে ঘোষণা করে পৌরাণিক নাটক শীর্ষক প্রবন্ধে গিরিশচংন্দ্র লেখেন, জাতীয় বৃত্তি পরিচালনা ব্যতীত কবিতা বা নাটক জাতির হিতকর হয় না। ভারতবর্ষের জাতীয় মর্ম-- ধর্ম । দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি যত প্রকার কথা আছে, তাহাতে কেহ ভারতের মর্মস্পর্শ করিতে পারবেন না। ভারত ধার্মিক। যাহার া লাঙ্গল ধরিয়া চত্রের রৌদ্রে হল সঞ্চালন করিতেছে, তাহারাও কৃষ্ণনাম জানে, তাহাদেরও মন কৃষ্ণনামে আকৃষ্ট।... যদি নাটক সার্বজনিক হওয়া প্রয়োজন হয়, কৃষ্ণনামেই হইবে। ..... ভারতবর্ষের মর্মে মর্মে ধর্ম। মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে। (বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক । অধ্যাপক পুলিন দাসের গদন্ধে উদ্ধৃত । পৃষ্ঠা২৩৩) গিরিশচন্দ্রে এই বিশেষ হিন্দুবাদী অবস্থানের কাররো এই হিন্দু পুনত্থানবাদী পত্রিকাগুলি শতকণ্ঠে তাঁর যশোকীর্তন করতে শু করে এবং তাকে প্রবল জনপ্রিয়তা লাভে সহায়তাকরে। অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত সাধারণী পত্রিকা লেখে, এতদিনে ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপনা সার্থক হইল। বাঙ্গালায় পৌরাণিক প্রকৃত নাটক হইল, হিন্দুর পড়িবার পুস্তক আবার হইল, ন াটকের ভাষা হইল, ভাষা বল পাইল,কৃত্তিবাস কাশীদাস পুলকিতচিত্ত হইলেন, গিরিশচন্দ্র লিলিপট, ব্রবড়িঙ্গনাগ অতিত্রম করিয়া আপনার স্বদেশ চিনিতে পারিলেন, আপনার আসন গ্রহণ করিলেন। এবং রাম লক্ষমণের গৌরবক্ষয় প্রয় াসী বিধর্মী মধুসূদনের কাব্য পুনর্জীবিত করিবার জন্য রঙ্গাঙ্গনে যত্ন করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিতেছিলেন এতদিনে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল আর আমরাও কঠোর সমালোচনার পাপ হইতে অব্যাহতি মুক্ত লেখনীতে গিরিশচন্দ্রে উপযুক্ত ধন্যবাদ করিয়া আমাদের কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিলাম।(১২ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮২। পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃঃ২৩৯) এই সর্বাত্মক হিন্দুবাদী উন্মাদনার বিদ্ধে যুগপুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিরদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ অনুরাগী মনস্বী সাংবাদিক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১২.৭.১৮৪৫-১২.৬.১৯০৪) , আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ প্রাজ্ঞ এবং নির্ভীক চিন্তাবিদেরা বলিষ্ঠকণ্ঠে সোচচার হলেও যুগপরিবেশের বিশেষ কারণে কখনই তা তেমন জোরালো হয়ে উঠতেপ ারেনি এবং সর্বাত্মক যুগ-সঙ্কটের নিরসন ঘটিয়ে নতুন কোন সম্ভবনার দিগন্তও উন্মোচিত করতে পারেনি। বরং একটা পর্য ায়ে গিয়ে(উনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনা মুহূর্তে) তাঁরা নিজেরাই এই সর্বময় হিন্দু পুনত্থানবাদী স্ব াদেশিকতার আবেশে অল্পবিস্তর আবিষ্ট এবং অভিভূত হয়ে পড়েন । মনে রাখা দরকার, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার এই উদ্ধত অহঙ্কার এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন কলরবের মধ্যে দাঁড়িয়েই অসাম্প্রদায়িক মীর মশার্‌রফ আলোচ্য গানটি রচনা করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত স্বদেশ ভারতবর্ষে একান্তভাবে হিন্দু ঐক্য, হিন্দু কল্যাণ বলে চিৎকার (গলাবাজী) করলে তা যে শেষ পর্যন্ত দেশের মহা সর্বনাশ(মৃত্যু) ঘটবে, একথা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উচচারণ করেছিলেন। হিন্দু সাহিত্যিক এবং সমাজনেবতারা যখন ভারতের অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের সাথে হিন্দুর স্বাতন্ত্র্য এবং তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে ব্যস্ত, মশার্‌রফ তখনই লিখলেন, নাই ভেদাভেদ কোন প্রভেদ হিন্দু মুসলমান । এ বড় কম কথা নয়। এই ঘটনার সামাজিক এবং রাজনৈতিক তাৎপর্য আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক কথায় অপরিসীম।

তবে প্রসঙ্গত একথাও সবিশেষ গুত্ব সহকারে উল্লেখ করা দরকার যে, সেকালের হিন্দু এবং ব্রাহ্ম , সমস্ত সাহিত্যিক, সম াজনেতা এবং মনীষীরাই এই মুসলিম বিদ্বেষভিত্তিক হিন্দু জাতীয়তাবাদের ধজাধারী ছিলেন না। বরং তাঁদের অনেকেই এইসব নির্বোধোচিত ভাবাবেগের আদৌ কোন মূল্য দিতে রাজী ছিলেন না। আবার কেউ কেউ সরাসরি এই সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার বিরোধিতায় অবতীর্ন হয়েছিলেন। এই মুষ্টিমেয় ব্যতিত্রমী মনস্বীদের মধ্যে প্রথমেই যার নাম উল্লেখ করা যায় তিনি বাংলার মহত্তম কবি এবং নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত (হিন্দু কুলোদ্ভব এই কবির খৃষ্টধর্ম গ্রহণের ঘটনাটি এই প্রসঙ্গে স্বতন্ত্র কোন গুত্ব বা তাৎপর্য বহন করে বলে মনে হয় না)। মধুসূদনের সংস্কারমুক্ত মন সাহিত্য এবং শিল্পকে সর্বদাই ইতিহাস এবং নন্দনতত্ত্বের নৈব্যক্তিক অবস্থান থেকে দেখতে চেয়েছে। আধুনিক মানবতাবাদের বলিষ্ঠ আদর্শে দীক্ষিত জ্ঞ ানবাদী মধুসূদন কখনই হিন্দুধর্ম ঐতিহ্যের গৌরব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখান। হিন্দুদের আরাধ্য দেবতা র

ামকে তিনি কাপুষ এবং ভণ্ড বলতেও কসুর করেননি। হিন্দুদের বৈরী রাবণ এবং তাঁর রাক্ষসকুলকে তিনি মহিমান্বিত করেছেন। সদর্পে । বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখা People here grumble and say that the heart of the Poet in Meghanad is with the Rakhasas. And that is the real truth. I despise Ram and his rabble but the idea of Ravan, elevates and kindles my imagination, he was a grand fellow.'মেঘনাদ বধ' কাব্যে সংকীর্ণ ধর্মীয় ভাবাবেগের উর্দ্ধে উঠে তিনি মানু

যের মনুষ্যত্ব, বীরত্ব, শৌ, এবং মানবিক ঔদার্যের জয়গান ধবনিত করেছেন। মুসলিম সম্রাট ইলতুতমিশ-কন্যা বীরাঙ্গনা সুলতানা(সম্রাজ্ঞী) রিজিয়ার জীবনকাহিনী অবলম্বন করে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি ইংরাজী ভাষায় কাব্যনাটক রচনা করেন। এসম্পর্কে প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক অধ্যাপক ক্ষেত্রগুপ্ত লিখেছেন মধুসূদন মাদ্রাজে একটি ইংরেজী ক াব্যনাট্য লিখেছিলেন, Rizia - the Empress of Indiaমাদ্রাজের ইউরেশিয়ান পত্রিকায় ১৮৪৯-৫০ সালে এটি ক্রমান বয়ে সাতটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। শিরোনামায় থাকত DRAMATIC LITERATURE (Original) RIZIA-- EMPRESS OF INDIA (A Dramatic fragment).রচয়িতার নাম না থাকলেও বুঝতে অসুবিধা হয়না মধুসূদনই এর লেখক । কারণ পরে বাংলায়'রিজিয়া' নাটকের জন্য যে পরিকল্পনা তিনি তৈরী করেছিলেন তার সঙ্গে এই রচনার অ াশ্চর্য মিল।....... শ্রী সুরেশ প্রসাদ নিয়োগী এই রচনাটি উক্ত পত্রিকা থেকে সংকলনকরে 'চতুষ্কোণ' বৈশাখ ১৩৮০-তে মুদ্রিত করেন(দ্রষ্টব্যঃ মধুসূদন রচনাবলী। সাহিত্য সংসদ। ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪। ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত সংশোধিত সংস্করণ। ভূমিকা অংশ। পৃষ্ঠা ৭৫)। শুধু কাব্য নাটকই নয়, এই মুসলমান সম্রাজ্ঞীর ঐতিহাসিক চরিত্রকে অবলম্বন করে তিনি বাংলায়'রিজিয়া'র কাহিনী অবলম্বনে মধুসূদনের এই নাটকরচনার পরিকল্পনায় বেলগাছিয়া থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ স্পষ্টতই তাদের অনীহার কথা নাট্যকারকে জানিয়ে দেন। মুসলমানী বিষয়ের প্রতি ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত হিন্দু ন াট্যমোদীদের এই অযৌক্তিক বিরূপতা নাট্যকার মধুসূদন যথেষ্ট বিরক্ত বোধ করেন। সেকালের যশস্বী নাট্যশিক্ষক এবং বেলগাছিয়া মঞ্চের প্রভাবশালী নট,বন্ধু কেশব চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে লেখা চিঠিতে বলেছেন, "I'm quite ready to undertake another drama, but... we ought to take up Indo-Musulman subjects. The Mohamadans are fiercer race than ourselves and own afford splendid opportunity for the display of passion. ... After this we must look to "Rezia- I hope that will be a drama after your own heart!. The prejudice against Muslim name must be given up."(1st Sept.1860) কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেশব চন্দ্রের নির্দেশই তাকে শিরোধার্য করে নিতে হয়। মুসলমানী কাহিনীর পরিবর্তে বাধ্য হয়ে তাকে হিন্দু বাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। এমতাবস্থ ায়, তিনি টর্ট সাহেবের Annals and antiquities of Rajasthan অবলম্বন করে "কৃষ্ণ কুমারী" নাটক রচনা করেন। তবে এই প্রসঙ্গে আরো একটি তথ্য বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য তাহল এই যে, মধুসূদনের মৃত্যুর (১৮৭৩) বারো বৎসর পরে (১৮৮৫) মহর্‌রম-এর বিষাদ ময় কাহিনীকে অবলম্বন করে মীর মশার্‌রফ হোসেন তার মহাকাব্য কল্প সুবিশাল গ্রন্থ ' বিষাদ-সিন্ধু'(১৮৮৫-১৮৯১) রচনায় আত্ম নিয়োগ করেছিলেন। সেই মহর্‌রমের ঘটনার অসাধারণ মহাকাব্যিক সম্ভাবন ারকথা উল্লেখ করে তার প্রায় ২৫ বছর আগে (১৮৬১ ?) মধুসূদন তার অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে এক চিঠিতে বলেছেন, "If a great poet were to rise among the Musulman in India, he could write a magnificent Epic on the death of Hosen and his brother. He could enlist the feelings of the whole race on his behalf. We have no such subject, would you belive it? /আবার, এই নাট্যকার মধুসূদনই তার দুঃসাহসিক প্রহসন " বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ" (১৮৫৯) - তে হিন্দুবাদীদের প্রতিক্রিয়ার কোন পরোয়া না করে ধর্মধবজী হিন্দু জমিদারের ' যবনীলোলুপতার (যেন তেন প্রকারেণ দরিদ্র মুসলমান কৃষক রমণীর দেহ সম্ভোগ) একটি ঋিত এবং সজীব চিত্র এঁকেছেন। পাইক পাড়ার রাজা ঈশ্বর চন্দ্র সিংহের তিনি এই ঘরোয়া প্রহসনছডঙ্গপ্পন্দ্বব্দদ্ধনন্তু ন্দ্রজন্তন্দ্বগ্ন -টি রচনা করলেও এবং 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের পরেই এটি বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হবার স্থির সিদ্ধান্ত থাকলেও এতে একজন 'ধর্মপ্রাণ' হিন্দু ভূস্বামীর 'যবনী লোলুপতার সাংঘাতিক ' কাহিনী বিবৃত হওয়ায় নাট্য শালার ধনী কর্তৃপক্ষ এবং তাহাদের বন্ধু পরিজনেরা প্রহসনটি মঞ্চস্থ করতে অসম্মত হন। ফলতঃ অত্যন্ত উৎসাহের সাথে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নাট্যকার মধুসূদন'একেই কি বলে সভ্যতা?' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামে যে উৎকৃষ্ট দুটি প্রহসন রচনা করেন তার কে ানটি বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হতে পারে নি। " প্রভাবশালী মহল থেকে এজাতীয় ব্যাঙ্গাত্মক রচনা সম্পর্কে' অ

াপত্তি করায় ঈশ্বর চন্দ্র প্রতাপ চন্দ্র প্রহসন - অভিনয়ের পরিকল্পনা ত্যাগ করেছিলেন।" (দ্রষ্টব্যঃ ভূমিকা- পৃষ্ঠা-৫৪৩। মধুসূদন রচনাবলী-। সাহিত্যসংসদ। সম্পাদনাঃ ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত।) ধর্মীয় এবং সামাজিক কারণে সময়কালে কোন নাট্যশালাই এই জাতীয় প্রহসন গুলি. অভিনয়ে রাজী হয়নি। বন্ধু এবং সহকর্মীদের এই কাপুযোচিত ভূমিকা কবিকে গভীরভাবে আহত ও ব্যথিত করেছিল। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন "Mind, you broke my wings once about the farces". " রচিত হবার বহুকাল পরে প্রহসন গুলি প্রথম অভিনয় হয়। ১৮৬৫ সালের ১৮ই জুলাই ' শোভাবাজার থিয়েট্রিকাল সোসাইটি ' কর্তৃক "একেই কি বলে সভ্যতা?" এবং ১৮৬৮ সালে আরপুলি নাট্য সমাজ কর্তৃক 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রথম অভিনীত হয়। পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন ধরে এদের অভিনয় নাট্যরসিক মহলে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। প্রসঙ্গত আরো উল্লেখযোগ্য যে গ্রাম্য জমিদারের অত্যাচার সংক্রান্ত নাটক রচনার জন্য সংবাদ পত্রের লোভনীয় আর্থিক পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি সহ বিজ্ঞাপন দিয়েও ' জোড়া সাঁকোর নাট্য শালা' কর্তৃপক্ষ কোন অভিনয় যোগ্য নাটক পাননি-- তবুও তারাও প্রভাবশালী মহলের বিরূপ প্রতিত্রিয়ার আশংকায় 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ ' প্রহসন মঞ্চায়নের সাহসী হন নি।

মুসলমান বিদ্বেষকেই যাঁরা(ভারতীয়) জাতীয়তাবাদের প্রধান অবলম্বন হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকার করেন, উনবিংশ শতাব্দীর সেই মুষ্টিমেয় মনীষীদের মধ্যে আর একটি উজ্জ্বল নাম অবশ্যই মহাত্মা শিবনাথ শাস্ত্রী। ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত তাঁর পুষ্পমালা কাব্যগ্রন্থে বহূদূরে নয় কবিতায় অনাগত ভারতের অগ্রগতি এবং কল্যাণের মহতী লক্ষ্যে বোম্বাই, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীদের আহ্বান জানানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজপুত, শিখকেও আহ্বান জানিয়েছেন এবং উক্ত কবিতাটির প্রায় সমাপ্তিতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক শিবনাথ উদারচিত্তে মুসলমানকেও আহ্বান জানিয়েছেন। (ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ। শিবনাথ শাস্ত্রী সংখ্যা। ১৪০৪) তিনি লিখেছেন, শেষে ডেকে বলি মুসলমান ভাই,/প্রাচীন শত্রুতা প্রয়োজন নাই। / দেশের দুর্দশা দেখ হল ঢের,/ তোরা ত সন্তান প্রিয় ভারতের।/ সে শত্রুতা ভুলে আয় প্রাণ খুলে।/ পুতে রাখ কথ- মুসলিম, কাফের/ বল শুধু মোরা প্রিয় ভারতের। সমসাময়িক কালে ঢাকা নিবাসী প্রখ্যাত মুসলিম কবি কয়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২) , হিন্দু এবং মুসলমান, পরাধীন ভারতের এই দুই ধর্ম সম্প্রদায়ের অনুগামীদের যাবতীয় অহং এবং আত্মাভিমান ভুলে পরস্পরের সাথে একাত্ম হিন্দুমেলার কালবর্বে সদ্য আত্মপ্রকাশের আনন্দময় আর্তিতে উদ্বেল কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথের মানসিত ডদৎও দড়ে উঠেছিল এই মুসলমান-বিদ্বেষী হিন্দু জাতীয়তাবাদের ভাবোন্মাদনাময় বাতাবরণেই। প্রথম জীবনে রচিত তাঁরঅনেকগুলি কবিতাতেই এই জায়মান হিন্দু চেতনার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। এ সম্পর্কে বিস্তারিতদৃষ্টান্তসহ প্রামাণিক আলোচনা করেছেন আচার্য্য প্রবোধচন্দ্র সেন এবং আরো অনেকেই । শ্রীসেন লিখেছেন, হিন্দুমেলায় উপহার কবিতায় দেখি রাজা যুধিষ্ঠির আর্য-সিংহাসনে বসে স্বাধীন ভারতে যে স্বর্ণযুগের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তারই মোহময় কল্পনায় বালক রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত বিভোর হয়ে আছে । আবার দেখি এই ভারতভূমিতে বিগত কালের মহিমামণ্ডিত রামরাজত্ব ফিরিয়ে আনার জন্য কবির হৃদয় ব্যাকুল হয়ে আছে। -- শুনেছি আবার শুনেছি আবার/

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com